

# ক্যান্টর-এর স্বর্গ : গণিতের মুক্তি

মিহির চক্রবর্তী

(প্রথম পর্ব)

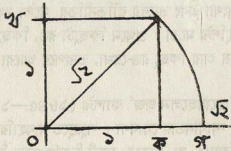
গণিত সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন ; সে দায়বদ্ধ শুধুমাত্র দুটি বিষয়ে—তার অন্তর্গত ধারণাগুলির (Concepts) যেন স্ববিরোধী না হয় এবং ইতিপূর্বে তৈরি ও পরীক্ষিত ধারণাগুলির সঙ্গে নতুন ধারণাগুলি যেন সংজ্ঞার সাহায্যে একটি পরস্পরায় সুবিন্যস্ত থাকে। যেমন ধরে নেওয়া যাক ১, ২, ৩, ৪,...এই পূর্ণসংখ্যাগুলি। মনে করে নেওয়া যাক এদের ধারণা ইতিপূর্বেই তৈরি হয়ে আছে আমাদের মনে এবং এদের ব্যবহারের রীতিও আমাদের জানা রয়েছে। এইবার একটি নতুন ধারণা, ধরা যাক মূলদ (rational) সংখ্যার ধারণা, সৃষ্টি করতে গেলে পূর্ণসংখ্যা এবং তাদের রীতিনীতির সঙ্গে সংগতি রেখেই তা করতে হবে। এ খানিকটা ছবি সৃষ্টির মতো। প্রথমে কিছুটা রঙ, কিছুটা রেখা নিয়ে শুরু। তারপরে, তার সঙ্গে মানিয়ে আর কিছু রঙ-রেখা, তারপরে আরো কিছু। এই সংযোজনে দায় শুধু সংগতি রক্ষার।

এভাবেই গণিতকে দেখতে চেয়েছিলেন জর্জ ক্যান্টর (১৮৪৫—১৯১৮)। এ এক আশ্চর্য মন্ডিত্বের স্বাদ। অভূতপূর্ব স্বাধীনতার ঘোষণা। শুরুতে ব্যবহারিক প্রয়োজনে, পশুদের হিসেব অথবা জমির পরিমাপ বা যজ্ঞের বেদী নির্মাণ হয়ত ছিল গণিতের উদ্ভাবনে। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই সেই বন্ধন ছাড়িয়ে এসেছিল গণিত। বিশুদ্ধ জ্ঞান বা ঈশ্বর-সান্নিধ্যলাভের সোপান হিসেবে গণ্য হতে এর খুব বেশি সময় লাগেনি। কিন্তু তবু একটা টান থেকে গিয়েছিল মাটির দিকে। অসংখ্য সংখ্যার সৃষ্টি বাস্তব কারণেই প্রয়োজনীয় ছিল। সংখ্যার ঝড়ি অনিঃশেষণীয় বলে ধরে নিতে তাই কোনো প্রশ্ন ওঠেনি। এমনকি অমূলদ সংখ্যা  $\sqrt{2}$  ইত্যাদি নিয়ে অনেক রহস্যময়তা সত্ত্বেও প্রায় চোখের সামনে অনুভব করা যাচ্ছিল এর অস্তিত্বকে। পর পৃষ্ঠার ছবিটি লক্ষ করুন।

ক এবং খ-বিন্দুদুটি যদি ০ থেকে প্রত্যেকে ১ একক দূরে থাকে তাহলে গ বিন্দু ০ থেকে যতটা দূরে তার পরিমাপ  $\sqrt{2}$  একক। ক-বিন্দুকে যদি ১ সংখ্যাটির সাথে অভিন্ন ভাবা হয় তাহলে গ-বিন্দুকে  $\sqrt{2}$  মনে করা ছাড়া উপায় কী? এভাবে যে কোনো গাণিতিক ধারণা কোনো ধরনের বাস্তবতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে সৃষ্টি হলে তার মর্যাদা বৃদ্ধি হত। এই মাটিমুখীনতা যেন একটু টেনে ধরতে চাইছিল গণিতের চলার গতি। একটা স্তরে এসে, বিগত শতাব্দীর দ্বিতীয় অংশে, এই দায়কে বাঁধন বলেই মনে হয়েছে অনেকের।

আর এক ধরনের বন্ধনমোচনেরও প্রয়োজন হয়ে পড়ছিল। অসীম বা অন্তহীন সংখ্যার শিখি এবং বিন্দুরাশি নিয়ে গণিত খেলা করে আসছে বহুকাল থেকে। কিন্তু একটা সাবধান-

বাণীও ভিতরে-ভিতরে কাজ করে গেছে সব সময়। দেকাত' যেভাবে তা ব্যক্ত করেছেন তা হল—‘We shall not weary ourselves with disputes about infinite, since, finite as we are, it would be perverse to attempt to make any determination of it, turning it, as it were, into something finite that we can conceive...’। এ তো মনের গতিকে, বা কল্পনাকে রাশ টেনে ধরার অথবা আশঙ্কার ধ্বনি। চন্দ্র এক, পক্ষ দুই, নেত্র তিন, বেদ চার,...দিক দশ; কিন্তু সংখ্যা? সংখ্যা কতগুলি? নিশ্চয়ই অসীম। কিন্তু শূন্য অসীম বলাই কি যথেষ্ট? গণিতজ্ঞরা তো পূর্ণ, মূলদ, অমূলদ, বাস্তব—কত রকমের সংখ্যা নিয়েই কাজ করেছেন, এ সব ধরনের সংখ্যার সমষ্টিই তো অসীম। কিন্তু সকলেই কি একই ধরনের অসীম? অনন্তেরও কি প্রকারভেদ আছে? এই ধরনের ভাবনা কি আদৌ সংগত? প্রাচীনরা (যেমন গ্যালিলেও, লাইবনিৎজ, কসি, গাউস) বললেন ‘না’। সীমাবদ্ধ মানুষ কখনও অসীমকে ‘বুঝতে’ পারবে না। সংখ্যার ঝড়ি থেকে যত খুশি সংখ্যা তুলে নিয়ে তোমার গণিত



ঠের কর আপত্তি নেই, কিন্তু মোট কতগুলি সংখ্যা আছে সে ঝড়িতে এ প্রশ্ন অবাস্তব, মোট সংখ্যার কোনো সংখ্যা দিতে চেষ্টা করো না। তাছাড়া ১ অথবা ২ এর মতো কোনো কিছুর মনে করা যাক  $\omega$ , যদি ব্যবহার করা হয়ও সমস্ত পূর্ণসংখ্যার ঝড়িটির দিকে আঙুল দেখিয়ে, তাহলে কী মানে হবে এই চিহ্নটির ব্যবহারিক ক্ষেত্রে? কী এর বাস্তবতা?

ক্যান্টর যেহেতু চাইছিলেন অসীমের ধারণা নিয়েও পাটীগণিত রচনা করতে অর্থাৎ অনন্ত দ্যোতক সংখ্যাধের যোগ গুণ ইত্যাদি প্রক্রিয়ার আওতায় নিয়ে আসতে, তাঁকে পূর্বোক্ত দু-ধরনের আপত্তিই উত্তর দিতে হয়েছে। আমার মনে হয় যে খোলা হাওয়া তাঁর মনের পালে লেগেছিল তার শক্তি ছিল অমোঘ এবং ছিল সাহস। প্রথম আপত্তি প্রসঙ্গে তিনি বললেন অনন্তকে মূলত দু'টি ভাগে ভাগ করতে হবে—Potential এবং Actual. এই বিভাজন অবশ্য অ্যারিস্টটলের সময় থেকেই প্রচলিত। অসীমের প্রথম ধারণার মধ্যে রয়েছে এই দাবি যে এমন একটি ঝড়ি থেকে অর্থাৎ যে ঝড়িকে Potential infinite এর উদাহরণ বলে ধরা যাবে, সেই ঝড়ি থেকে যতগুলি খুশি সামগ্রী তুলে আনা সম্ভব। এর ভাঙার অফুরন্ত। এই ঝড়িটি সামগ্রিকভাবে গণিতের বিষয়ীভূত হতে পারবে না কিন্তু তার অফুরান সামগ্রী গণিতের অঙ্গ। গণিতেই প্রয়োজন এমন যে সে সামগ্রীর উৎস

যেন শেষ না হয়ে যায়। অসীমের দ্বিতীয় ধারণায় একটি অখণ্ডতা, সমগ্রতা এবং পূর্ণতা। অখণ্ড-অনন্ত, সমগ্র-অনন্ত বা পূর্ণ-অনন্ত। অথচ এই সমগ্রতা সকল সীমায়িত সমগ্রতাকে ছাড়িয়ে। [ By an actual infinite is understood a quantum which on the one hand is not variable, but rather is fixed and determined in all its parts as a genuine constant—but which at the same time surpasses in magnitude every finite quantity of the same kind.—ক্যান্টর। ] প্রথম ধারণাটি নিয়ে গণিতের জগতে কোনো ম্বন্দ ছিল না। ম্বন্দ ছিল দ্বিতীয়টি নিয়ে। ভাবা হতো এই সীমাহীন সমগ্রতাই তো ঈশ্বর—পরম অনন্ত (absolute infinite)। সীমায় বদ্ধ মানদ্বয় একে শুদ্ধই ‘স্বীকার’ করে নিতে পারে, ‘বদ্ব্যতে’ পারে না কখনো। একে নিয়ে আঁক কষবে কী করে সে ?

ক্যান্টর আপত্তি করলেন ঠিক এখানটিতেই। তিনি বললেন actual infinity-ও দ্ব-ধরনের—যাদের ক্রমাগত বাড়িয়ে চলা সম্ভব এবং যাকে আর বাড়ানো অসম্ভব। প্রথম ধরনের অনন্তকে গণিতের পর্যালোচনার মধ্যে আনা যায়। বদ্ধম্ব্যক্তি দিয়ে বোঝা যায়। ব্যবহার করা যায়। এরা নিজেরা এক-একটি অখণ্ড সমগ্র সত্তা, সসীম সমগ্রতা থেকে অবশ্যই বড় কিন্তু যাকে আরো বাড়ানো সম্ভব। আর দ্বিতীয় ধরনের অনন্ত—সেই পরম অনন্ত—হচ্ছে ঈশ্বর। উদাহরণের আশ্রয় নেওয়া যাক একটু।

পূর্ণ সংখ্যার মোট সংখ্যা যদি একটি ধারণা বলে স্বীকার করে নেওয়া হয় এবং ওই সংখ্যাকে যদি  $\omega$  দিয়ে সূচিত করা হয় তাহলে  $\omega$  একটি বর্ধনযোগ্য actual infinity। কারণ যে কোনো অসীম সংখ্যা থেকে তা বড় কিন্তু একই সঙ্গে  $\omega + 1$ ,  $\omega + 2$  ইত্যাদি সংখ্যার ধারণাও তৈরি করা সম্ভব, অর্থাৎ এক, দুই করে  $\omega$ -কে আরো বাড়িয়ে চলা সম্ভব ঠিক যেভাবে যে কোনো আমাদের পরিচিত সসীম সংখ্যাকে বাড়ানো যায়। দেখা যাক আরো একটু স্পষ্ট করে।

সেট ( বা ঝড়ি )	তার সামগ্রী সংখ্যা
[ ১ ]	১
( যে সেট-এ শুধু ১ সংখ্যাটি আছে )	
[ ১, ২ ]	২
[ ১, ২, ৩ ]	৩
.....	.....
.....	.....
এইভাবে,	
[ ১, ২, ৩, ..... ]	$\omega$
[ ১, ২, ৩, ..... ; ক ]	$\omega + ১$
[ ১, ২, ৩, ..... ; ক, খ ]	$\omega + ২$
.....	.....



$\omega, \omega + 1, \omega + 2, \dots$  ইত্যাদি দিয়ে যা চিহ্নিত হল তাকে তো সংখ্যার মতোই কিছু বলতে হবে—বাঁদিকের ঝড়িটিতে ক’টি সামগ্রী রয়েছে এই প্রশ্নের উত্তর তারা। এই চিহ্নগুলির কল্পনা, তাকে সংখ্যার মর্যাদা দান এবং শূন্য তা-ই নয়, তাদের নিয়ে গাণিতিক ক্রিয়াকর্ম যোগ গুণ ইত্যাদি চালানোর পদ্ধতি উদ্ভাবন গণিত ও দর্শনে ক্যান্টরের এক দুঃসাহসী পদক্ষেপ, প্রায় অ্যাডভেঞ্চার। তাঁর নিজের কথায়—‘It is my conviction that the domain of definable quantities is not closed off with the finite quantities and that the limits of our knowledge may be extended accordingly without this necessarily doing violence to our nature.’ কল্পনাকে এভাবে এগিয়ে নেওয়া হয়েছে—সাধারণ সংখ্যার পরে অসীম সংখ্যা, তাদের ব্যবহারযোগ্য (গাণিতিক অর্থে) করে তোলা হয়েছে। কিন্তু একটা সতর্কতা। আমাদের মানসপ্রকৃতি যেন আহত না হয় এই নতুন কল্পনায়। মন যেন চায় তাকে।

এবারে স্বভাবীয় আপত্তির প্রসঙ্গ। অর্থাৎ কী অর্থময়তা বহন করবে এই নতুন চিহ্নগুলি? কী যোগাযোগ এর ‘মাটির’ সঙ্গে, নিদেনপক্ষে স্বজ্ঞার (intuition) সঙ্গে? এই জাতীয় প্রশ্নের জবাব দেবার দায় কাটিয়ে এসেছিলেন গণিতজ্ঞরা বহুকাল পূর্বেই—প্লেটোর সময় থেকে অথবা হয়ত তারও আগে। কিন্তু তবু এই প্রশ্ন ওঠেও বার বার—কারণ চারদিকের একটা পৃথিবী থাকে, তার সঙ্গে গণিত জড়িয়ে থাকে, গণিতজ্ঞ জড়িত থাকেন। গণিতের স্রষ্টাদের সঙ্গে উদ্ভাবনের কোনো একটা সীমারেখা টানতে চায় সমাজ। তাই কোনো একটি নতুন গাণিতিক ধারণা বা তত্ত্ব মর্যাদা অর্জন করতে বেশ সময় নেয়, বিশেষ করে তা যদি প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে যায়। অ-ইউক্লিডীয় জ্যামিতির ভাগ্য এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য।

ক্যান্টরের মতে প্রকৃতির পাঠশালা থেকে ইন্দ্রিয় বা বিশুদ্ধ স্বজ্ঞা মারফৎ আমরা তার (প্রকৃতির) সূক্ষ্মতর সাংগঠনিক আকার সম্পর্কে সামান্যই জানতে পারি। বরং প্রকৃতিকে বদ্বতে হলে তার সঙ্গে আমাদের মূখোদুমুখি হতে হয় কতগুলি ধারণা-কাঠামো (Conceptual framework) সঙ্গে নিয়ে—অর্থাৎ একধরনের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। দেশ ও কাল (Space এবং Time) কে বদ্বতে হলে Continuum এই গাণিতিক ধারণার সাহায্যেই তা বোঝার চেষ্টা করতে হবে। অর্থাৎ বিশুদ্ধ যুক্তিপরিম্পরালব্ধ ধারণা-কাঠামো তৈরি করে নিতে হবে আগেই, খানিকটা প্রিজমের মতো। যার মধ্যে প্রকৃতিকে ধরতে হবে এবং তবেই তার আলোর সূক্ষ্মতর গঠনটি সাত রঙে প্রতিভাত হবে। এই ধারণা-কাঠামোগুলি তৈরি করাই গণিতের কাজ, একাজে বহির্বিশ্বের ভূমিকা নগণ্য। বরং বহির্বিশ্বকে বোঝার কাজে আগে থেকেই এই ধারণা-কাঠামো তৈরি করে নেওয়া প্রয়োজন। কাজেই দায় নেই গণিতের কোনো  $\omega$ —এই ধারণাটিকে প্রকৃতিতে অনূদিত করার। তথাকথিত ‘মাটির’ সঙ্গে কোনো সংযোগ আছে কি নেই কোনো গাণিতিক ধারণার এ প্রশ্ন মূল্যহীন হয়ে পড়ে তাহলে। আজ গণিতের চর্চা যেভাবে হচ্ছে থাকে তাতে প্রশ্নটা ওঠেই না। কয়েকটি প্রাথমিক ধারণার ভিতরে উপরে একটি

নতুন ধারণা যুক্ত হয়ে যায়। এই ধারণা সৃষ্টিতে প্রকৃতি হয়ত গণিতস্রষ্টাকে উস্কে দিয়ে থাকতে পারে, কিন্তু কোনো অবস্থাতেই দায়বদ্ধ নয় সে প্রকৃতির কাছে। এই হল দ্বিতীয় মন্দির, এক পরম মন্দির। চিত্রশিল্পীকে তার রেখা ও রঙের বা কবিকে তার কবিতার শব্দগুণের মানে বলে দেবার হাত থেকে রেহাই।

এইভাবে গণিত ক্যান্টরের তরীতে ভেসে এক স্বর্গের দিকে যাত্রা করল যে যাত্রায় তার প্রধান দৃষ্টি বন্ধনই আলগা হয়ে গেছে। এখন আমরা দেখব এই মন্দির সীমা কোথায়। ধারণাগুণি জুড়ে-জুড়ে একটি কাঠামো বা গণিতের অবয়ব সৃষ্টির কাজে গণিতশিল্পীর দায়বদ্ধতা ঠিক কোনখানে। আমরা দেখেছি সসীমের গণ্ডি সে ভেঙেছে। এমন অনন্তের সৃষ্টি করেছে যা নিজে সে অল্প আয়াসেই খেলা করতে পারে। এ অনন্ত যেহেতু পরম নয়, তাই ঈশ্বরের আসনে কোনো আঘাত আসবে না এই নতুন খেলায়। এই অর্থে অসীম নিয়ে আলোচনা করলেও গণিতকে ঈশ্বরের কাছে জবাবদিহি করতে হবে না। প্রকৃতির কাছেও সে জবাবদিহি করতে রাজি নয় অর্থাৎ তার সৃষ্ট ধারণাগুণি বা ধারণাগুণি দিয়ে তৈরি করা কাঠামো কোন বাস্তব প্রকৃতিকে প্রতিকলিত করে বা আদৌ করে কি না এই প্রশ্ন এখন তার কাছে আবাস্তর। তাহলে সে কোথায় বাঁধবে নিজেকে? কোন স্ব-আরোপিত দায়বদ্ধতায় সে নিজেকে আবদ্ধ করবে?

এর উত্তর 'স্ববিরোধিতা' (Contradiction)। গণিতস্রষ্টার একমাত্র ভাবনা এবং দূর্ভাবনা তার সৃষ্ট ধারণাগুণি যেন স্ববিরোধমুক্ত হয়, ইতিপূর্বে তৈরি ধারণাগুণির সঙ্গে যেন এক সুন্দর পরস্পরায় বিন্যস্ত থাকে এবং ভবিষ্যতেও এই ধারণাগুণি থেকে যেন কোনো স্ববিরোধের জন্ম না হয়।

ফলত গণিত বহিজ্জগতের কাছে দায়হীন, স্ববিরোধমুক্ত একটি সুচারু খেলায় এসে পরিণতি পায়। এর মধ্যে কোনোরকম 'সত্য'র অনুসন্ধান অর্থহীন হয়ে পড়ে।

অথচ ক্যান্টর তা চাননি। ছবির তুলনায় ফিরে আসা যাক আবার। শিল্পী তো খেলতেই শুরুর করেন প্রথমে। খানিকটা রঙ-রেখার পরে আরো কিছুটা রঙ বা রেখা চাপিয়ে-চাপিয়ে, tension সৃষ্টি করে, balance রক্ষা করে। ছবিটি কি পূর্ণতা পায় এভাবে, একসময়ে? যদি তা-ই হয় তাহলে কি কোনো সত্যের সন্ধান আছে এই পূর্ণ হয়ে ওঠার ভিতরে? একটি উদ্ভিদ যেমন পূর্ণ হয়ে ওঠে ফুলে এবং ফলে একটির পরে একটি কোষ সংযোজন করে করে, যার পরে এই বিশেষ উদ্ভিদজীবনের আর কোনো অতিরিক্ত পূর্ণতা নেই। যেমন তার মধ্যে একটি সত্য পাই, যার গভীরে প্রকৃত অর্থে খামখেয়ালিপনা (arbitrariness) নেই। যেন এভাবেই হয়ে ওঠবার কথা ছিল। যেন একটা পর্যায়ের পরে মনে হয় বেশ, এখানেই পূর্ণতা, এখানেই ইতি টানা হোক।

ক্যান্টরের গাণিতিক ধারণা সৃষ্টির কাজে, আমার মনে হয়, এমনই কোনো পূর্ণ হয়ে ওঠার বোধ কাজ করে। কোনো নতুন ধারণা যখন প্রথম কোনো গণিতস্রষ্টা নিয়ে

আসতে চান তাঁর আলোচনা ক্ষেত্রে তখন তা একটি চিহ্নমাত্র। অর্থাৎ প্রথমে আসে একটি নতুন চিহ্ন ( $\omega$  যেমন পূর্বের উদাহরণে)। কিন্তু এই চিহ্নটির কাছে কিছু আশা করেন এর স্রষ্টা। তাই সে চিহ্ন একের পরে এক গুণ আরোপ করতে থাকেন তিনি। এ গুণাবলী হল নবাগত চিহ্নের পূর্বনো ধারণাগুণগুলির সঙ্গে সম্পর্কসমূহ। যেমন  $\omega$  সমস্ত সসীম সংখ্যা থেকে বড় হোক।  $\omega$  চিহ্ন থেকে ছোট যা-ই হোক তা যেন সসীম সংখ্যা হয়।  $\omega$  থেকে যে কোনো সসীম সংখ্যা বিয়োগ করলে যেন  $\omega$ -ই থেকে যায়। এই রকম সমস্ত দাবি করতে থাকেন গণিতস্রষ্টা তাঁর নবাগতের কাছে। এই সম্পর্কগুলিই তার সজ্জা। স্রষ্টা তাঁর নবাগত চিহ্নটিকে ক্রমে সাজিয়ে তোলেন ‘কুসুমে রতনে’। এরপরে তাঁকে থামতে হয় একসময়। মনে হয় হ্যাঁ, ঠিক এ-ই তো আমি চেয়েছি। এই তো ঠিকমতো ‘হয়ে ওঠা’ হল। পূর্ণতা হল। ক্যান্টরের নিজের লেখা থেকে একটি উদ্ধৃতি, একটু দীর্ঘ, কিন্তু তাৎপর্যমন্ডিত :

‘The process with the correct formation of concepts is in my view always the same. One lays down a thing without properties which at first is nothing other than a name or a sign A. One then duly gives to it different even infinitely many predicates, whose significance is known through already present ideas, and which must not contradict one another. In this way the relations of A to concepts already present and especially to similar concepts are determined. With this one has then completely finished ; all conditions for the *awakening* of the concept A which slumbered within us are present, and it comes completed into being, furnished with that intro-subjective reality which is generally all that can be demanded from concepts.’

এ শুদ্ধ একটি তৈরি কাঠামোর সঙ্গে নতুন কিছু, সংগতি বিনষ্ট না করে, জুড়ে দেওয়া নয়—তার থেকে আরো বেশি কিছু। যা সংলগ্ন করতে চাইছি তার যেন একটি নিজস্ব পরিপূর্ণতা থাকে এবং ফলে সমগ্র কাঠামোটিতে নবসংযুক্ত বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে অন্তর্গত হয়ে ওঠে, বাড়তি মনে হয় না, মনে হয় না আর তাকে ছেঁটে ফেলা যায় মূল কাঠামো থেকে। গণিতের শরীরের এই বেড়ে ওঠার একটা স্বাভাবিকতা থাকে, একটি গাছের বেড়ে ওঠার মতো হয়ত।

এবং সে কারণেই কোনো সত্যও হয়ত থাকে গণিতে।

যে স্বর্গ ক্যান্টর গড়লেন সেখানে গণিত পেল অক্ষরহীন মূর্তির স্বাদ। আজ গণিতের মূল ধারা এই স্বর্গ থেকেই উৎসারিত। কিন্তু এ কাহিনীর শেষ এভাবে করা যাচ্ছে না—‘অতঃপর (স্বর্গ) রাজ্যে সর্বত্র সুখ ও শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল।’ অবিচ্ছিন্ন শান্তিতে ফাটল দেখা দিয়েছে, অশান্তি আঘাত করছে দরজায়। গণিত যেন একটু



অস্থির হয়ে উঠেছে এই স্বর্গ-সুখে। সে কি আবার মৃদু প্রত্যাশী—এবার ক্যান্টরের স্বর্গ থেকে? এ প্রশ্নের আলোচনা বারান্তরে। □

সহায়ক রচনাপঞ্জি :

*Cantorian Set theory and limitation of size*, Michael Hallett, Clarendon Press, 1986

*Mathematics, the loss of certainty*, Morris Kline, Oxford University Press, 1980

Note :

Fuzzy set theory was conceived by Prof. Lotfi Zadeh to present mathematical model for vagueness. Since its introduction in 1965 researchers from all over the globe have joined in the development of this novel idea both in its theoretical and applicational aspects. In India also considerable interest has been generated among the academicians in this new theory and so far two national-level seminars : the first in the Department of Pure Mathematics, University of Calcutta in 1984, and the second one in the Department of Mathematics, University of Tripura, 1991. The next such seminar is being held by the Depts. of Mathematics and Computer Science, Visva Bharati, this year from Feb. 26 to 28. Besides the above mentioned departments, researchers of ECSU, I.S.I Calcutta have taken pioneering role in the enhancement of research in the applications of Fuzzy set theory. The following is a partial list of centres in India where research work is going on in this field. The specific areas of activities are also mentioned.

Centre	Area of activities
Dept. of Pure Math. Cal. Univ.	Fuzzy relations, Fuzzy logic, Category theoretic approach to fuzzy sets, Fuzzy algebraic structures and Fuzzy topology, Applications to decision theory.
ECSU I S I, Calcutta	Application of Fuzzy set theory in image processing logic programming and other related areas.
Dept. of Math. Visva Bharati	Fuzzy topology, applications.

Dept. of Math.	Fuzzy topology.
Burdwan Univ.	
Dept. of Math.	Fuzzy algebra and topology.
I I T, Kharagpur	
Dept. of Electrical	Applications.
Engineering	
I I T, Kharagpur	
Dept. of Math.	Fuzzy topology and Categories.
B H U	
Dept. of Math.	Fuzzy topology and applications to decision
Tripura University	theory.
Dept. of Math.	Fuzzy topology.
Allahabad Univ.	
School of Physical	Fuzzy algebra and applications
Science, J N U	
Dept. of Appl. Math.	
Cochin Univ.	
Waltair	
Dharwad	
Ramanujan Institute	

This list is only a partial one. A society on Fuzzy set theory and Information processing has been founded in 1986 and the society has been the co-sponsors of the seminars held so far. To the knowledge of this correspondent five Ph. D. theses have been completed exclusively on Fuzzy set theory so far, the first being done at the Dept. of Pure Math. Cal. Univ. Besides, there are numerous M. Phil. theses submitted.

It is observed that people belonging to various disciplines other than Mathematics, e. g., Computer Science, Philosophy, Electronics and Economics are being more and more drawn towards this theory.